أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

(Book# 114/U) www.motaher21.net

وَقَالُوا كُونُوا

" আর তারা বলে..."

" And others say..."

সুরা: আল-বাক্বারাহ

আয়াত নং :- ১৩৫

وَ قَالُوْا كُوْنُوْا هُوْدًا اَوْ نَصٰرٰى تَهْتَدُوْا ؕ قُلْ بَلْ مِلَّةَ اِبْرٰهٖمَ حَنِيْفًا ؕ وَ مَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ

ইহুদিরা বলে, “ইহুদি হয়ে যাও, তাহলে সঠিক পথ পেয়ে যাবে।” খৃস্টানরা বলে, “খৃস্টান হয়ে যাও, তা হলে হিদায়াত লাভ করতে পারবে।” ওদেরকে বলে দাও, “না, তা নয়; বরং এ সবকিছু ছেড়ে একমাত্র ইবরাহীমের পদ্ধতি অবলম্বন করো। আর ইবরাহীম মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।”

১৩৫ নং আয়াতের তাফসীর:

ইয়াহূদীরা মুসলিমদেরকে ইয়াহূদী ধর্মের দিকে আর খ্রিস্টানরা খ্রিস্ট-ধর্মের দিকে আহ্বান করত এবং বলত: এটাই হিদায়াতের পথ।

অত্র আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন, হে নাবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদের বলে দাও, মিল্লাতে ইবরাহীমের অনুসরণের মধ্যেই রয়েছে প্রকৃত হিদায়াত। তিনি ছিলেন ‘হানিফ’ (একনিষ্ঠ অর্থাৎ সমস্ত মা ‘বূদ থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করে কেবল এক উপাস্যের ইবাদতকারী) এবং তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। অথচ ইয়াহূদী ও খ্রিস্টানধর্মের মাঝে শির্কের মিশ্রণ রয়েছে।

ইমাম বুখারী (রহঃ) অত্র আয়াতের তাফসীরে এ হাদীস নিয়ে এসেছেন- আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আহলে কিতাবগণ ইবরানি ভাষায় তাওরাত পড়ে মুসলিমদের জন্য আরবি ভাষায় তাফসীর করত। তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

لَا تُصَدِّقُوا أَهْلَ الْكِتَابِ وَلَا تُكَذِّبُوهُمْ، وَقُولُوا :آمَنَّا بِاللهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا

আহলে কিতাবদেরকে বিশ্বাস করো না আবার মিথ্যা প্রতিপন্নও করো না। বরং বল আমরা আল্লাহ তা ‘আলার প্রতি ও আমাদের প্রতি যা কিছু নাযিল হয়েছে তার প্রতি ঈমান এনেছি। (সহীহ বুখারী হা: ৪৪৮৫)

অত্র আয়াতে আমাদেরকে সকল নাবী-রাসূলের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তার প্রতি ঈমান আনার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ সকল নাবী-রাসূল এবং তাদের ওপর অবতীর্ণ আসমানী কিতাব সত্য বলে বিশ্বাস করব, আর মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওপর অবতীর্ণ কিতাব কুরআন ও তাঁর সুন্নাহ অনুসরণ করব।

أسباط ‘আসবাত’ হল ইয়া ‘কূব (আঃ)-এর বংশধরে বানী ইসরাঈলের বারটি গোত্রে যে সকল নাবী রাসূল এসেছেন তারা।

নাবী রাসূলগণের প্রতি ঈমানে চারটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত:

১. এ বিশ্বাস রাখা যে, তাদের রিসালাত আল্লাহ তা ‘আলার পক্ষ থেকে।

২. যে সকল নাবী-রাসলের নাম জানা যায় তাদের প্রতি বিশ্বাস রাখা। যেমন ঈসা, মূসা, ইবরাহীম (আলাইহিমুস সালাম) প্রমুখ।

৩. তাদের ব্যাপারে যেসব সহীহ সংবাদ এসেছে তা বিশ্বাস করা।

৪. এসব নাবী-রাসূলের মধ্যে যাকে আমাদের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে অর্থাৎ মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর শরীয়ত অনুসরণ করা। (মাজমু ফাতাওয়া লি উসায়মীন)।

সকল নাবীদের ওপর ঈমান আনার ক্ষেত্রে কোন প্রকার পাথর্ক্য করি না, অর্থাৎ এমন নয় যে, কতক নাবীর প্রতি ঈমান রাখি আর কতক নাবীর প্রতি ঈমান রাখি না। যেমন আল্লাহ তা ‘আলা বলেন:

(اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ؕ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ ۫ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ ۫)

“রাসূল বিশ্বাস করেছেন যা তার রবের পক্ষ থেকে নাযিল হয়েছে এবং ঈমানদাররাও। প্রত্যেকেই আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতা, তাঁর কিতাবসমূহ এবং তাঁর রাসূলগণের প্রতি ঈমান এনেছেন। আমরা তাঁর রাসূলদের মধ্যে কোন পার্থক্য করি না।” (সূরা বাকারাহ ২:২৮৫)

অন্যত্র আল্লাহ তা ‘আলা এ ঈমান আনার ফলাফল বর্ণনা করেছেন:

(وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ وَلَمْ يُفَرِّقُوْا بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ اُولٰٓئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيْهِمْ اُجُوْرَهُمْ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا)

“যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণের প্রতি ঈমান আনে এবং তাঁদের একের সঙ্গে অপরের পার্থক্য করে না তাদেরকে তিনি অবশ্যই পুরস্কার দেবেন, আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।” (সূরা নিসা ৪:১৫২)

যদি আহলে কিতাবগণ সকল আসমানী কিতাব এবং রাসূলের প্রতি ঈমান আনার ক্ষেত্রে কোন পাথর্ক্য না করে তাহলে তারা সুপথপ্রাপ্ত। আর যদি মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে এ বিষয়ে সাক্ষ্য হিসেবে আল্লাহ তা ‘ আলাই যথেষ্ট। আল্লাহ তা ‘আলা সবকিছু শুনেন ও সবকিছু জানেন।

(صِبْغَةَ اللّٰهِ) ‘আল্লাহর রং’ অর্থাৎ

الزموا صبغة الله

আল্লাহর রং আঁকড়ে ধর। ইবনু আব্বাস (রাঃ) সহ অধিকাংশ মুফাসসির বলেন: আল্লাহর রং হল আল্লাহর দীন। (তাফসীর ইবনে কাসীর, অত্র আয়াতের তাফসীর) অর্থাৎ আল্লাহ তা ‘আলা তাঁর দীন ইসলামে যে সকল আদেশ করেছেন তা যথাযথভাবে পালন কর আর যা নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাক, তাহলেই আল্লাহ তা ‘আলার রঙে রঙ্গিন হওয়া যাবে।

খ্রিস্টানদের নিকট এক প্রকার হলুদ রঙের পানি থাকে; যা প্রত্যেক খ্রিস্টানশিশুকে এবং এমন প্রত্যেক ব্যক্তিকে পান করানো হয় যাকে খ্রিস্টান বানানোর উদ্দেশ্য থাকে।

এ অনুষ্ঠানের নাম 'ব্যাপটিজম' (পবিত্র বারি দ্বারা সিঞ্চিত করে খ্রিস্টান ধর্মের দীক্ষাদানোৎসব)। এটা তাদের কাছে অত্যধিক জরুরী ব্যাপার। এছাড়া তারা কাউকেও পবিত্র গণ্য করে না। মহান আল্লাহ তাদের এ বিশ্বাস খণ্ডন করে বলেন: আসল রং তো আল্লাহর রং। এর চেয়ে উত্তম কোন রং নেই। আর আল্লাহর রঙের তাৎপর্য হল, ইসলাম ধর্ম, যার দিকে প্রত্যেক নাবী স্বীয় জাতিকে আহ্বান করেছেন; যা ছিল তাওহীদের আহ্বান।

সুতরাং একমাত্র ইসলামই সঠিক ধর্ম, এ ধর্মের দাওয়াত নিয়ে প্রত্যেক নাবী দুনিয়াতে আগমন করেছেন। আমাদের উচিত এ ধর্মের আদেশ-নিষেধগুলো যথাযথভাবে পালন করা। বিভিন্ন দিক থেকে যারা তাদের ধর্মের দিকে আহ্বান করবে তাদের আহ্বানে সাড়া না দেয়া।

এ জবাবটির রসাস্বাদন করতে হলে দু' টি বিষয় সামনে রাখতে হবেঃএকঃ ইহুদিবাদ ও খৃস্টবাদ উভয়ই পরবর্তীকালের ফসল। ইহুদিবাদের সৃষ্টি খৃস্টপূর্ব তৃতীয়-চতুর্থ শতকে। তখনই 'ইহুদিবাদ' তার এ নাম, ধর্মীয় বৈশিষ্ট্য ও রীতি-পদ্ধতি সহকারে আত্মপ্রকাশ করে। আর যেসব বিশেষ আকীদা-বিশ্বাস ও ধর্মীয় চিন্তা-ভাবনার সমষ্টি খৃস্টবাদ নামে পরিচিতি লাভ করেছে তার অভ্যুদয় ঘটেছে হযরত ঈসা মসীহ আলাইহিস সালামেরও বেশ কিছুকাল পরে। এখানে স্বতস্ফূর্তভাবে একটি প্রশ্ন জেগে ওঠে। যদি ইহুদিবাদ ও খৃস্টবাদ গ্রহণ করাই হিদায়াত লাভের ভিত্তি হয়ে থাকে, তাহলে এ ধর্মগুলোর উদ্ভবের শত শত বছর আগে জন্মগ্রহণকারী হযরত ইবরাহীম (আ), অন্যান্য নবীগণ ও সৎব্যক্তিবর্গ, যাদেরকে ইহুদি ও খৃস্টানরা নিজেরাই হিদায়াতপ্রাপ্ত বলে স্বীকার করে, তারা কোথা থেকে হিদায়াত পেতেন? নিঃসন্দেহে বলা যায়, তাদের হিদায়াতের উৎস 'ইহুদিবাদ' ও 'খৃস্টবাদ' ছিল না। কাজেই একথা সুস্পষ্ট, যেসব ধর্মীয় বৈশিষ্ট্যের কারণে এই ইহুদি, খৃস্টান ইত্যাদি সম্প্রদায়গুলোর উদ্ভব হয়েছে মানুষের হিদায়াত লাভ এদের ধর্মীয় বৈশিষ্ট্যের ওপর নির্ভরশীল নয়। বরং যে বিশ্বব্যাপী চিরন্তন সহজ-সত্য পথ গ্রহণ করে মানুষ যুগে যুগে হিদায়াত লাভ করে এসেছে তারই ওপর এটি নির্ভরশীল।দুইঃ ইহুদি ও খৃস্টানদের পবিত্র ধর্মীয় গ্রন্থগুলোই হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের এক আল্লাহ ছাড়া আর কারোর ইবাদত-বন্দেগী, উপাসন–আরাধনা, প্রশংসা-কীর্তন ও আনুগত্য না করার সাক্ষ্য প্রদান করে। আল্লাহর গুণ-বৈশিষ্ট্যের মধ্যে আর কাউকে শরীক না করাই ছিল তাঁর মিশন। কাজেই নিঃসন্দেহে বলা যায়, হযরত ইবরাহীম (আ) যে সত্য-সরল পথের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন ইহুদিবাদ ও খৃস্টবাদ তা থেকে সরে গিয়েছিল। কারণ এদের উভয়ের মধ্যেই শিরকের মিশ্রণ ঘটেছিল।

সুরা: আল-বাক্বারাহ

আয়াত নং :-১৩৬

قُوْلُوْٓا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَ مَآ اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَ مَآ اُنْزِلَ اِلٰٓى اِبْرٰهٖمَ وَ اِسْمٰعِيْلَ وَ اِسْحٰقَ وَ يَعْقُوْبَ وَ الْاَسْبَاطِ وَ مَآ اُوْتِيَ مُوْسٰى وَ عِيْسٰى وَ مَآ اُوْتِيَ النَّبِيُّوْنَ مِنْ رَّبِّهِمْ ۚ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ ۫ وَ نَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ

হে মুসলমানরা!তোমরা বলো, “আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর প্রতি, যে হিদায়াত আমাদের জন্য নাযিল হয়েছে তার প্রতি এবং যা ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব ও ইয়াকুবের সন্তানদের তাদের রবের পক্ষ থেকে দেয়া হয়েছিল তার প্রতি। তাদের কারোর মধ্যে আমরা কোন পার্থক্য করি না। আমরা সবাই আল্লাহর অনুগত মুসলিম।”

তাফসীর :

মহান আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তা এবং সমস্ত নবীগণকে মুসলিমরা স্বীকার করে

মহান আল্লাহ তার মু’ মিন বান্দাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, যা কিছু মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ওপর অবতীর্ণ হয়েছে তার ওপর যেন তারা একনিষ্ঠভাবে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং যা তাঁর পূর্ববর্তী নবীগণের ওপর অবতীর্ণ হয়েছিলো ঐগুলোর ওপরেও যেন সংক্ষিপ্তভাবে ঈমান আনে। ঐ পূর্ববর্তী নবীগণের মধ্যে কারো কারো নামও নেয়া হয়েছে এবং অন্যান্য নবীগণের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়েছেন। সাথে সাথে মহান আল্লাহ এ কথাও বলেছেন যে, তারা যেন নবীগণের মধ্যে প্রভেদ সৃষ্টি না করে। যে বা যারা তাদের কোন একজনকে অবিশ্বাস করে ঐসব লোক নিশ্চিত রূপেই কাফের। এদের সম্পর্কেই মহান আল্লাহ বলেনঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَ رُسُلِه وَ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّفَرِّقُوْا بَيْنَ اللّٰهِ وَ رُسُلِه وَ يَقُوْلُوْنَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَّ نَكْفُرُ بِبَعْضٍ ۙ وَّ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّتَّخِذُوْا ﴿بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلًا اُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ حَقًّا ﴾

‘নিশ্চয়ই যারা মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণের প্রতি অবিশ্বাস করে এবং মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণের মধ্যে পার্থক্য করতে ইচ্ছা করে এবং বলে, আমরা কতিপয়কে বিশ্বাস করি ও কতিপয়কে অবিশ্বাস করি এবং তারা এর মধ্যবর্তী পথ অবলম্বন করতে ইচ্ছা করে তারাই প্রকৃত অবিশ্বাসী। (৪ নং সূরা নিসা, আয়াত নং ১৫০-১৫১) আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, কিতাবীরা তাওরাতকে ইবরানী ভাষায় পাঠ করতো এবং ‘আরবী ভাষায় এর তাফসীর করে মুসলিমদেরকে শোনাতো। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ

"لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تُكَذبوهم، وقولوا :آمنا بالله وما أنزل إلينا ‘তোমরা আহলে কিতাবীদেরকে বিশ্বাস করো না এবং অবিশ্বাসও করো না, বরং বলো যে, আমরা মহান আল্লাহ্র ওপর এবং তাঁর অবতারিত কিতাবসমূহের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করছি।’ (সহীহুল বুখারী-৮/৪৪৮৫, ফাতহুল বারী ৮/২০) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ফজরের দু’ রাক ‘আত সুন্নাত সালাতের প্রথম রাক ‘আতে ﴿اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَ مَآ اُنْزِلَ اِلَيْنَا﴾

‘আমরা মহান আল্লাহ্‌র প্রতি এবং নিকট যা কিছু অবতীর্ণ করা হয়েছে তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করছি। (২ নং সূরা বাকারাহ, আয়াত নং ১৩৬) এই আয়াতটি সম্পূর্ণ পড়তেন এবং দ্বিতীয় রাক ‘আতে ﴿اٰمَنَّا بِاللّٰهِ ۙ وَ اشْهَدْ بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ﴾ ‘আমরা মহান আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করছি। অতএব তোমরা সাক্ষী থাকো যে, নিশ্চয় আমরা মুসলিম। (৩ নং সূরা আল ‘ইমরান, আয়াত ৫২) এই আয়াতটি পড়তেন। (হাদীস সহীহ। সহীহ মুসলিম ১/৯৯/৫০২, সুনান আবূ দাঊদ-২/২০/১২৫৯, সুনান নাসাঈ-২/৪৯৩/৯৪৩)

اَسْبَاطٌ ইয়া ‘কূব (আঃ)-এর পুত্রগণকে বলা হতো। (তাফসীর ইবনে আবি হাতিম ১/৩৯৯) তাঁরা ছিলেন বারোজন। প্রত্যেকের বংশে বহু লোকের জন্ম হয়। বানী ইসরাঈলকে قَبَائِل বলা হতো এবং বানী ইসরাঈলকে اَسْبَاطٌ বলা হতো। ইমাম যামাখশারী (রহঃ) ‘তাফসীরে কাশ্‌শাফে’ লিখেছেন যে, এরা ছিলো ইয়া ‘কূব (আঃ)-এর পৌত্র, যারা তাঁর বারোটি পুত্রের সন্তানাদি ছিলো। সহীহুল বুখারীতে রয়েছে যে, قَبَائِل এর ভাবার্থ হচ্ছে ‘বানী ইসরাঈল।’ তাদের মধ্যেও নবী হয়েছিলেন, যাদের ওপর ওয়াহী অবতীর্ণ হয়েছিলো। মহান আল্লাহ মূসা (আঃ) এর উক্তি নকল করেন যা তিনি বানী ইসরাঈলকে সম্বোধন করে বলেছিলেনঃ ﴿اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَعَلَ فِيْكُمْ اَنْۢبِيَآءَ وَ جَعَلَكُمْ مُّلُوْكًا﴾

‘স্মরণ করো, যখন মূসা তার সম্প্রদায়কে বলেছিলো, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা তোমাদের প্রতি মহান আল্লাহ্‌র নি ‘য়ামত স্মরণ করো যে, তিনি তোমাদের মধ্যে নবী করেছেন এবং তোমাদের বাদশাহ করেছেন।’ (৫ নং সূরা মায়িদাহ, আয়াত নং ২০) অন্য জায়গায় মহান আল্লাহ বলেনঃ

﴿وَ قَطَّعْنٰهُمُ اثْنَتَیْ عَشْرَةَ اَسْبَاطًا﴾ ‘আমি বানী ইসরাঈলকে বারোটি গোত্রে বিভক্ত করেছি।’ (৭ নং সূরা, আ ‘রাফ, আয়াত নং ১৬০) ইমাম কুরতুবী (রহঃ) বলেন যে, الأسباط এর মূল অক্ষর হচ্ছে سبْط যার অর্থ পর্যায়ক্রমে দলভূক্ত হওয়া। কেউ কেউ বলেছেন سبَط এর ب বর্ণে যবর দিয়ে যার অর্থ অধিক বৃক্ষ। الأسباط এর একবচন হলো سبطة। ইবনে ‘আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, দশজন নবী ছাড়া সমস্ত নবীই বানী ইসরাঈলের মধ্য হতে হয়েছেন। ঐ দশজন নবী হচ্ছেনঃ (১) নূহ (আঃ) (২) হুদ (আঃ) (৩) সালিহ্‌ (আঃ) (৪) শু ‘আইব (আঃ) (৫) ইবরাহীম (আঃ) (৬) ইসহাক (আঃ) (৭) ইয়া‘কূব (আঃ) (৮) ইসমা ‘ঈল (আঃ) এবং শেষ নবী (৯) মুহাম্মাদ মুস্তাফা (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)। (সিয়ারু আ ‘লামুন নুবালা ১৬/৬৩, আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া ১১/২৭০)

ইমাম কুরতুবী (রহঃ) বলেন যে, ‘সিবত’ হলো একদল লোক অথবা গোত্র যারা একই বংশ থেকে উদ্‌ভুত। (তাফসীরে কুরতুবী, হাদীস নং ২/১৪১) কাতাদাহ (রহঃ) বলেনঃ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মু’মিনদেরকে আদেশ করেছেন যে, তারা যেন তাঁর ওপর ঈমান অটুট রাখে এবং তিনি যে কিতাব নাযিল করেছেন ও রাসূল প্রেরণ করেছেন তাদের ওপরও ঈমান আনে। (তাফসীর ইবনে আবি হাতিম ১/৪০০) সুলাইমান ইবনে হাবীব (রাঃ) বলেনঃ আমাদেরকে আদেশ করা হয়েছে যে, আমরা যেন মূল তাওরাত ও ইঞ্জিলকে বিশ্বাস করি, কিন্তু তা যেন অনুসরণ না করি বরং কুর’আনই যেন যথেষ্ট মনে করি। (হাদীসটি য ‘ঈফ। তাফসীর ইবনে আবি হাতিম ১/৪০০)

নবীদের মধ্যে পার্থক্য না করার অর্থ হচ্ছে, কেউ সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন এবং কেউ সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন না অথবা কাউকে মানি এবং কাউকে মানি না---আমরা তাদের মধ্যে এভাবে পার্থক্য করি

না। আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত সকল নবীই একই চিরন্তন সত্য ও একই সরল-সোজা পথের দিকে আহবান জানিয়েছেন। কাজেই যথার্থ সত্যপ্রিয় ব্যক্তির পক্ষে সকল নবীকে সত্যপন্থী ও সত্যের প্রতিষ্ঠিত বলে মেনে নেয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। যে ব্যক্তি এক নবীকে মানে এবং অন্য নবীকে অস্বীকার করে, সে আসলে যে নবীকে মানে তারও অনুগামী নয়। কারণ হযরত মূসা (আ), হযরত ঈসা (আ) ও অন্যান্য নবীগণ যে বিশ্বব্যাপী চিরন্তন সহজ-সত্য পথ দেখিয়েছিলেন সে আসলে তার সন্ধান পায়নি বরং সে নিছক বাপ-দাদার অনুসরণ করে একজন নবীকে মানছে। তার আসল ধর্ম হচ্ছে, বর্ণবাদ, বংশবাদ ও বাপ-দাদার অন্ধ অনুসরণ! কোন নবীর অনুসরণ তার ধর্ম নয়।

আয়াত ১৩৭ নং

فَإِنْ ءَامَنُوا بِمِثْلِ مَآ ءَامَنتُم بِهِۦ فَقَدِ ٱهْتَدَواۖ وَّإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِى شِقَاقٍۖ فَسَيَكْفِيكَهُمُ ٱللَّهُۚ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ

অতঃপর তোমরা যেরূপ ঈমান এনেছ তারাও যদি সেরূপ ঈমান আনে, তবে নিশ্চয় তারা হেদায়াত পাবে। আর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে তারা বিরোধিতায় লিপ্ত সুতরাং তাদের বিপক্ষে আপনার জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট। আর তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ।

১৩৭ নং আয়াতের তাফসীর:

মহান আল্লাহ বলেন, ‘তারা যদি তেমন ঈমান আনে’ অর্থাৎ আহলে কিতাবদের মধ্যেকার কাফেরগণ বা অন্যান্য কাফেরগণ যদি তোমাদের মতো যাবতীয় কিতাব ও রাসূলের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে তাহলে তারাও সুপথ প্রাপ্ত হবে এবং মুক্তি পেয়ে যাবে। আর যদি দালীল ও প্রমাণ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও তারা ঈমান আনা হতে বিরত থাকে তাহলে নিশ্চিতরূপে তারা ন্যায় ও সত্যের উল্টা পথে রয়েছে। হে নবী! সেই সময় তোমাকে তাদের ওপর জয়যুক্ত করে মহান আল্লাহ তাদের জন্য তোমাকেই যথেষ্ট করবেন।’

নাফি ‘ ইবনে আবূ নাঈম (রহঃ) বলেন যে, কোন একজন খলীফার নিকট ‘উসমান (রাঃ) এর কুর’ আন মাজীদ পাঠানো হয়। একথা শুনে যিয়াদ নামক এক ব্যক্তি নাফি ‘ ইবনে আবূ না ‘ঈমকে বলেনঃ জনসাধারণের মধ্যে একথা ছড়িয়ে রয়েছে যে, যখন ‘উসমান (রাঃ) কে শহীদ করা হয় সেই সময় এই কালামুল্লাহ অর্থাৎ কুর’ আন মাজীদ তার ক্রোড়ে বিদ্যমান ছিলো এবং তার রক্ত ঠিক এই শব্দগুলোর ওপর ছিলো فسيكفيكحم الله وهوالسميع العليم একথা কি সত্য? তখন নাফি ‘ (রহঃ) বলেনঃ এটা সম্পূর্ণ রূপে সঠিক কথা। আমি স্বয়ং এই আয়াতের ওপর ‘উসমান যিন্নরাইন (রাঃ) এর রক্ত দেখেছিলাম।

অতঃপর মহান আল্লাহ্‌র বাণী صبغة الله দ্বারা উদ্দেশ্য কি হতে পারে এ ব্যাপারে ইবনে ‘আব্বাস (রাঃ) সহ বিভিন্ন মনীষীর উক্তি হলো, তা হচ্ছে মহান আল্লাহ্‌র দ্বীন তথা ধর্ম। অর্থাৎ মহান আল্লাহ্‌র দ্বীনের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকো। কেউ কেউ বলেন যে, এটা ملة ابرحيم হতে بدل হয়েছে যা এর পূর্বে বিদ্যমান রয়েছে। সিবওয়াই (রহঃ) বলেন যে, مصدر مو كد এবং آمنا بالله এর কারণে এর ওপর نصب হয়েছে। যেমন وعد الله এর ওপর হয়েছে।

ইবনে ‘আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ

"إن بني إسرائيل قالوا :يا موسى، هل يَصْبُغ ربك؟ فقال :اتقوا الله .فناداه ربه :يا موسى، سألوك هل يَصْبُغ ربك؟ فقل :نعم، أنا أصبُغ الألوان :الأحمر والأبيض والأسود، والألوان كلها من صَبْغي".

বানী ইসরাঈলগণ মূসা (আঃ) কে বললো যে, হে মূসা (আঃ)! আপনার প্রতিপালকও কি রং করেন? তখন মূসা (আঃ) বললেন তোমরা মহান আল্লাহ কে ভয় করো। মহান আল্লাহ তখন মূসা (আঃ) কে ডেকে বললেনঃ তারা কি তোমাকে জিজ্ঞেস করছে যে, তোমার প্রভু কি রং করেন? তিনি বললেনঃ হ্যাঁ, তখন মহান আল্লাহ বললেনঃ তুমি তাদেরকে বলে দাও যে, লাল, সাদা, কালো, ইত্যাদি সমুদয় রং মহান আল্লাহ সৃষ্টি করেন। অত্র আয়াতেরও ভাবার্থ এটাই। কিন্তু হাদীসটি মাওকূফ হওয়াই সঠিক কথা এবং মাওকূফ হওয়াটাও তার ইসনাদ বিশুদ্ধ হওয়ার ওপর নির্ভর করে।

সুরা: আল-বাক্বারাহ

আয়াত নং :-১৩৮

صِبْغَةَ اللّٰهِ ۚ وَ مَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ صِبْغَةً ۚ وَّ نَحْنُ لَهٗ عٰبِدُوْنَ

বলোঃ “আল্লাহর রঙ ধারণ করো! আর কার রঙ তার চেয়ে ভালো? আমরা তো তাঁরই ইবাদাতকারী।”

১৩৮ নং আয়াতের তাফসীর:

আল্লাহ্‌র রং বলতে অধিকাংশ মুফাসসিরীনের নিকট উদ্দেশ্য হলোঃ আল্লাহ্‌র দ্বীন বা ইসলাম। সারমর্ম হলো - যা কিছু বর্ণিত হলো, তা হলো আল্লাহ্‌র দ্বীন, তাঁর নবী ইবরাহীমের মিল্লাত, এটা হলো সর্বোত্তম রং। আয়াতটির দুটি অনুবাদ হতে পারে। (এক) আমরা আল্লাহ্‌র রং ধারণ করেছি। (দুই) আল্লাহ্‌র রং ধারণ কর। নাসারাদের দ্বীনের আত্মপ্রকাশের পূর্বে ইয়াহুদীদের মধ্যে একটি বিশেষ রীতির প্রচলন ছিল। কেউ তাদের

দ্বীন গ্রহণ করলে তাকে গোসল করানো হত। আর তাদের ওখানে গোসলের অর্থ ছিল, তার সমস্ত গোনাহ যেন ধুয়ে গেল এবং তার জীবন যেন রং ধারণ করল। পরবর্তী কালে নাসারাদের মধ্যেও এ রীতির প্রচলন হয়। তাদের ওখানে এর পরিভাষিক নাম হচ্ছে – 'ইস্‌তিবাগ' বা রঙ্গিন করা (ব্যাপ্টিজম)। তাদের দ্বীনে যারা প্রবেশ করে কেবল তাদেরকেই ব্যাপ্টাইজড করা হয় না, বরং নাসারা শিশুদেরকেও ব্যাপ্টাইজড করা হয়। এ ব্যাপারেই বলা হচ্ছে যে, এ লোকাচারমূলক রঞ্জিত হবার যৌক্তিকতা কোথায়? বরং আল্লাহ্‌র রঙে রঞ্জিত হও। যা কোন পানির দ্বারা হওয়া যায় না। বরং তাঁর বন্দেগীর পথ অবলম্বন করে এ রঙে রঞ্জিত হওয়া যায়।

এ আয়াতটির দু' টি অনুবাদ হতে পারে। একঃ আমরা আল্লাহর রং ধারণ করেছি। দুইঃ আল্লাহর রং ধারণ করো। খৃস্ট ধর্মের আত্মপ্রকাশের পূর্বে ইহুদিদের মধ্যে একটি বিশেষ রীতির প্রচলন ছিল। কেউ তাদের ধর্ম গ্রহণ করলে তাকে গোসল করানো হতো। আর তাদের ওখানে গোসলের অর্থ ছিল, তার সমস্ত গোনাহ যেন ধুয়ে গেলো এবং তার জীবন নতুন রং ধারণ করলো। পরবর্তীকালে খৃস্টানদের মধ্যেও এ রীতির প্রচলন হয়। তাদের ওখানে এর পারিভাষিক নাম হচ্ছে ইসতিবাগ বা রঙীন করা (ব্যাপটিজম)। তাদের ধর্মে যারা প্রবেশ করে কেবল তাদেরকেই ব্যাপটাইজড বা খৃস্ট ধর্মে রঞ্জিত করা হয় না বরং খৃস্টান শিশুদেরকেও ব্যাপটাইজড করা হয়। এ ব্যাপারেই কুরআন বলছে, এ লোকাচারমূলক 'রঞ্জিত' হবার যৌক্তিকতা কোথায়? বরং আল্লাহর রঙে রঞ্জিত হও। যা কোন পানির দ্বারা হওয়া যায় না। বরং তাঁর বন্দেগীর পথ অবলম্বন করে এ রঙে রঞ্জিত হওয়া যায়।

আয়াত হতে শিক্ষণীয় বিষয়:

১. ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্মে হিদায়াত ও সফলতা নেই।

২. কোন একজন রাসূলকে অস্বীকার করা মূলত সকল রাসূলকে অস্বীকার করার শামিল। তাই সকলের প্রতি কোন পার্থক্য ছাড়াই ঈমান আনতে হবে।

৩. ইয়াহূদ ও খ্রিস্টানরা মুসলিমদেরকে পথভ্রষ্ট করার জন্য বিভিন্ন সাহায্য, প্রলোভন ইত্যাদির মাধ্যমে তাদের ধর্মের দিকে আহ্বান করবে আমাদের সে সম্পর্কে সজাগ থাকতে হবে।

৪. আমাদের সকলের উচিত ইসলামের আদেশ নিষেধগুলো মেনে চলা, তাহলেই আমরা আল্লাহর রঙে রঞ্জিত হতে পারব।